অঁরি কার্তিয়ে ব্রেসঁ

নির্ণায়ক মুহূর্ত

অনুবাদ: অরূপরতন হালদার

"নির্ণায়ক মুহূর্তটি ছাড়া এ-পৃথিবীতে আর কিছুর অস্তিত্ব নেই।"... কার্ডিনাল রেজ

আমি আরো অনেকের মতোই আলোকচিত্রের জগতে আবির্ভূত হয়েছিলাম একটি ব্রাউনি ক্যামেরার মাধ্যমে; যেটা আমি ছুটির সময় বিভিন্ন মুহূর্ত বন্দি করার কাজে ব্যবহার করতাম। শৈশব থেকেই আমার চিত্রশিল্পের প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল আর বৃহস্পতি ও রবিবার এটা নিয়ে মেতে উঠতাম। কারণ, এই দুটো দিনে ফ্রান্সের বাচ্চাদের স্কুলে যেতে হতো না। ক্রমে আমি ক্যামেরা নিয়ে নড়াচড়া করার বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেললাম। যে-মুহূর্ত থেকে ক্যামেরা ব্যবহার করা এবং সে-সম্বন্ধে ভাবতে শিখে গেলাম তখন থেকেই ছুটির ছবি আর বন্ধুদের হাস্যকর সব ছবির পরিসমাপ্তি। আমি এ-ব্যাপারে আরো চিন্তাশীল হয়ে উঠলাম। যেন অন্য কিছুর গন্ধ পেতে লাগলাম আর সে-গন্ধ শোঁকার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

তারপর সেই-সব সিনেমা। বেশ কিছু মহান চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমি কোনো কিছুর দিকে কিভাবে তাকাতে হবে সেই দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হলাম। পার্শ হোয়াইটের সঙ্গে *মিস্ট্রিজ অব নিউইয়র্ক*, ডি.ডব্লু. গ্রিফিতের মহান চলচ্চিত্র— *ব্রোকেন ব্লসমস্*, স্ট্রোহেমের প্রথম ছবিগুলো; *গ্রিড*; আইজেনস্টাইনের *পোটেমকিন*; আর ড্রেয়ারের *জান্ দাখ্*(*Jeanne*

d'Arc)— এই-সব অসামান্য সৃষ্টিগুলি আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

পরে কয়েকজন ফোটোগ্রাফারের সঙ্গে আমার আলাপ হয় যাঁদের কাছে আভজের প্রিন্ট ছিল। এগুলোকে আমার অসামান্য বলে মনে হয়েছিল এবং এর পরেই আমি নিজে নিজেই একটা ট্রাইপড, কালো কাপড় আর পালিশ-করা তিন ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি ওয়ালনাট ক্যামেরা কিনে ফেললাম। ক্যামেরাটার সঙ্গে— শাটারের বদলে— একটা লেন্সের ঢাকনি লাগানো ছিল যেটা কেউ সরিয়ে নিলেই— ছবি উঠে যেত। শেষের এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলোই আমার মধ্যে স্থির-হয়ে-থাকা-মুহূর্তগুলোর পৃথিবী সম্বন্ধে আলাদা একটা চ্যালেঞ্জের জন্ম দিয়েছিল। ফোটোগ্রাফি-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়গুলো আমার কাছে বেশি জটিল মনে হতো, অথবা কখনো মনে হতো "অপরিণত ব্যাপারস্যাপার"। আর এই সময়ের মধ্যেই এটা আমাকে চমৎকৃত করেছিল যে এ-সব জিনিসের প্রতি জেগে-ওঠা অনাগ্রহ আমাকে ক্রমশ নিয়োজিত করেছিল সেই আর্টের দিকে, যা সূচিত হয় বড়ো অক্ষরের 'আ' দিয়ে।

এরপর আমি আমার এই নিজস্ব শিল্পরীতিটিকে ক্রমশ আরো বিকশিত করে তুললাম আমার ধোয়াধুয়ি করার বেসিনটাতে; ফোটোগ্রাফি-সংক্রান্ত সব ব্যাপারস্যাপারই অল্প-বিস্তর জানে এমন একজন হয়ে ওঠাটা আমাকে বেশ আমোদিত করেছিল। ছবি প্রিন্ট করার ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না, আর আমার তেমন কোনো ধারণাও ছিল না কোন্ বিশেষ ধরনের কাগজে প্রিন্ট-এর একটা কোমল স্নিগ্ধভাব আসে, আবার কোনো কোনো কাগজে চড়া ভাব আসে। এ-সব ব্যাপারে আমি তেমন মাথা ঘামাতাম না, যদিও যখন দেখতাম ছবি কাগজে ঠিকঠাক প্রিন্ট হয় নি তখন আমার মাথা খারাপ হয়ে যেত।

১৯৩১-এ যখন আমার বাইশ বছর বয়স, আফ্রিকায় গিয়েছিলাম। আইভরি কোস্ট-এ আমি ফরাসি কোম্পানি ক্রাউস-এর তৈরি একটা ছোটো ক্যামেরা কিনলাম; যে-ধরনের ক্যামেরা আগে কখনো দেখি নি। এটাতে স্প্রোকেট-এর খাঁজ ছাড়া ৩৫ মিমি ফিল্ম ব্যবহার হতো। এক বছর এই ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলেছিলাম। ফ্রান্সে ফিরে ছবিগুলো ডেভেলপ করেছিলাম— কারণ এর আগে তা সম্ভবপর ছিল না, বছরের বেশিরভাগ সময়ই আমি বনে-বাদাড়ে একা একা ঘুরে বেড়াতাম— আর আবিষ্কার করলাম যে, ক্যামেরার মধ্যে স্যাঁতসেঁতে আর্দ্রভাব ঢুকে গিয়েছিল এবং এর ফলস্বরূপ আমার সব কটা ছবির মধ্যেই ফার্নের মতো নকশার ছাপ আঁকা হয়ে গিয়েছিল।

আফ্রিকায় আমার কালাজ্বর হয়েছিল, তার ফলে সেরে উঠবার জন্য বিশ্রামে যেতে হলো আমাকে। আমি মার্সাই চলে গেলাম। ছোট্ট একটা হাত-খরচায় আমাকে চালিয়ে নিতে হতো সব। কিন্তু কাজ করতাম সানন্দে। সবে তখন লাইকা-কে আবিষ্কার করেছি। এটা যেন আমার দৃষ্টির একটা সম্প্রসারণ আর, এটা খুঁজে পাওয়ার পর এর থেকে আমি কখনো বিচ্ছিন্ন হই নি। আমি রাস্তার পর রাস্তা চুঁড়ে ফেলতাম প্রচণ্ড উত্তেজিত অবস্থায় যেন গুঁড়িয়ে ফেলব সব, আর যেন ফাঁদ পেতে ধরে ফেলব 'জীবন'— প্রতিদিনের জীবনের ভেতর জীবন-প্রবাহকে বাঁচিয়ে রাখার অভিপ্রায়ে। সর্বোপরি চোখের সামনে ক্রমশ ঘটে-যাওয়া

কোনো বিশেষ অবস্থার নির্যাসটিকে একটি একক আলোকচিত্রের ভেতর পুরে ফেলবার প্রবল প্রচেষ্টা চালাতাম।

ফোটোগ্রাফির সাহায্যে প্রতিবেদন তৈরি করার ব্যাপারটা অর্থাৎ বারবার কিছু ছবির সমন্বয়ে একটা কাহিনি সাজিয়ে তোলা কখনো আমার মাথাতেও আসে নি। পরে আমি ব্যাপারটা কিছুটা বুঝতে পেরেছিলাম আমার কিছু সহকর্মীর বিভিন্ন পত্রিকায় অলংকরণে ফোটোগ্রাফির ব্যবহার দেখে। সত্যি বলতে, সেই ধরনের কিছু পত্রিকায় কাজ করতে করতে একটু একটু করে বিভিন্ন ঘটনার ভেতর দিয়ে আমি শিখেছিলাম কিভাবে ফোটোগ্রাফির সাহায্যে গল্প বলা যায়।

আমি বেশ ভালোই ঘুরে বেড়াতাম, যদিও কিভাবে ঘুরব সে-ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা ছিল না। এ-ব্যাপারে বেশ সময় নিয়ে একটা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর একটা অবকাশ নিতাম যাতে আমার দেখা জিনিসগুলো আমি আত্মস্থ করতে পারি। কোনো নতুন দেশে উপস্থিত হলে মনে হতো সে-দেশের নিয়মকানুন মেনে সে-দেশেই থিতু হয়ে যাই। যদিও কোনোকালেই ভূ-পর্যটক ছিলুম না।

১৯৪৭-এ আমরা পাঁচজন ফ্রিল্যান্স আলোকচিত্রী মিলে আমাদের সমবায় উদ্যোগ হিসাবে "ম্যাগনাম ফোটোস" চালু করলাম। এই সমবায় সংস্থাটি বিভিন্ন দেশে আমাদের তৈরি ফোটোগ্রাফি-নির্মিত কাহিনিগুলো পরিবেশনার দায়িত্ব নেবে।

পঁচিশ বছর হয়ে গেল, যখন প্রথম আমি ভিউ-ফাইন্ডারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলাম। কিন্তু নিজেকে এখনও একজন অপেশাদার বলেই মনে করি; যদিও আমি কোনোমতেই তেমন কেউ নই— ফোটোগ্রাফি সম্বন্ধে যার ধারণা ভাসা ভাসা।

ছবি দিয়ে গল্প

ফোটোগ্রাফির মাধ্যমে কোনো আখ্যান তুলে ধরা অর্থাৎ ছবি দিয়ে গল্প বলা আসলে কী? কোনো কোনো সময় এমন এক-একটি অনন্য ছবির মুখোমুখি হই যার রচনাশৈলীর ভেতর যেমন গাম্ভীর্য তেমনই বলিষ্ঠতা থাকে, আর তার বিষয়বস্তুর দ্যুতি যেন ছবিটি থেকে চারদিকে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। তবে এটা একটা বিরল ঘটনা। যেমন মূল বিষয়গুলো একত্রে কোনো বিষয় থেকে আলোকছটার বিকিরণ ঘটাতে সক্ষম, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকে— দেশ অথবা কালের নিরিখে— আর উজাড় করে তাদের একত্র করলে যেটা দাঁড়ায় সেটা হলো একধরনের "কুশলী বন্দোবস্ত" আর, আমার মনে হয় সেটা মাথা খাটিয়ে কিছু একটা উদ্ভাবন করা। কিন্তু যদি সেই অন্তর্লীন সত্তার ছবি নেওয়া যেত আর সেইসঙ্গে ছবি নেওয়া যেত বিষয়ের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট স্ফূরণগুলোর, তাহলে ছবি দিয়ে গল্প বলাটা দাঁড়িয়ে যায়। সেই পাতাটা তখন অনেকগুলো ছবির মধ্যে ছড়িয়ে-থাকা পরিপূরক উপাদানগুলোকে একত্রে জড়ো করার কাজটা করে উঠতে পারে।

ছবি দিয়ে গল্প বলার ব্যাপারটা মস্তিষ্ক, চোখ আর হৃদয়— এই তিনের একটা যৌথ

উদ্যোগ। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হলো কোনো-একটা ঘটনার মূল বিষয় যেটি ক্রম-উন্মোচিত হচ্ছে সেটিকে উপস্থাপিত করা, আর এর ভাবটিকে সম্প্রসারিত করা। কোনো কোনো সময় একটা একক ঘটনা বিভিন্ন মাত্রায় এতটাই ঘনীভূত ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে যে, এর অভ্যন্তরীণ জটিলতাকে উন্মোচিত করার জন্য এর পেছনে লেগে থাকতে হতে পারে— কারণ অন্তহীন চলাই জগৎ, আর চলন্ত কোনো-কিছুর প্রতি মনোভাব স্থির বা জড় হয়ে থাকতে পারে না। কখনো ছবির দিকে তুমি কয়েক মুহূর্ত তাকাতে পার; আবার কয়েক ঘণ্টা বা দিনও লেগে যেতে পারে একটা ছবিকে ভালোভাবে দেখতে। এ-ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট বাঁধাধরা পরিকল্পনা বা ছক থাকে না যে-ছকে কাজ এগিয়ে নেওয়া যায়। তোমাকে মস্তিষ্ক, চোখ আর হৃদয় দিয়ে তৎপর থাকতে হবে, আর শরীরটিকে যথাসম্ভব নমনীয় রাখতে হবে।

বস্তু আসলে যা, তা-ই— ব্যাপারটা বস্তুগত প্রাচুর্যের এমনই ধারণা দেয় যে, একজন ফোটোগ্রাফারকে সবকিছু করে ফেলবার প্রলোভন থেকে দূরে থাকতে হয়। উপকরণ থেকে জীবন— সব ক্ষেত্রেই প্রত্যাহার জরুরি হয়ে পড়ে। কিন্তু এই প্রত্যাহারের মধ্যেও একটা বাছবিচার রাখতে হয়। কাজের সময় ফোটোগ্রাফারকে যথাযথভাবে অবহিত থাকতে হবে সে কী করতে চাইছে। কখনো মনে হতে পারে তুমি কোনো একটা দৃশ্য বা অবস্থার সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ-সমন্বিত ছবিটি তুলে ফেলেছ; তা সত্ত্বেও তোমাকে বাধ্যতামূলকভাবে ছবি তুলে যেতে হবে কারণ তুমি কখনোই আগে থেকে জানতে পারবে না সেই দৃশ্যটি বা অবস্থাটি কিভাবে তোমার সামনে ধরা দেবে। দৃশ্যটির অন্তর্লীন সত্তার ভেতর থেকে যে-উপাদানগুলি চারপাশে উন্মোচিত হয়ে উঠছে, সেটিই হবে তোমার বিষয়। একই সঙ্গে একজন মেশিনগান-চালকের মতো ছবি তুলে যাওয়াটাও কোনো কাজের কথা নয়, আর সেইসঙ্গে অর্থহীন একগাদা ছবি দিয়ে নিজেকে ভারাক্রান্ত করে তোলারও কোনো মানে নেই যা তোমার স্মৃতিকে এলোমেলো করে দেবে আর, সেটা রিপোর্টাজটার গতিমুখকেই নষ্ট করে ফেলবে।

স্মৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষ করে তুমি যখন দৃশ্যের সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিলে সেই সময়ে নেওয়া প্রতিটি ছবিকে ফিরে দেখার জন্য। ফোটোগ্রাফারকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, সে যখন দৃশ্যটির উন্মোচনের সঙ্গে অবস্থান করছে তার ভেতর যেন কোনো ফাঁক না থাকে, সে যেন দৃশ্যটির সামগ্রিকতার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তার রূপটিকে প্রকাশ করতে পারে, কারণ এ-ব্যাপারে একটু দেরি মানেই সেটা বড়ো বেশি দেরি হয়ে যাওয়া। কখনোই দৃশ্যটিকে ক্যামেরাবন্দি করার জন্য সেই দৃশ্যটিকে তার পক্ষে ফিরে দেখা সম্ভব নয়।

ফোটোগ্রাফারদের দু'ধরনের জিনিস বেছে নিতে হয় এবং যে-কোনো একটি শেষ অব্দি আপশোস ডেকে আনতে পারে। যখন আমরা ভিউ-ফাইন্ডারের মাধ্যমে বিষয়ের দিকে তাকাই তখন আমাদের বেছে নেওয়ার শুরু, আর ফিল্ম যখন ডেভেলপ করে প্রিন্ট

নেওয়া হয় তখন বেছে নেওয়ার দ্বিতীয় পালা। ডেভেলপ ও প্রিন্টের পর তোমাকে যে-ছবিগুলো খুব একটা জোরালো বলে মনে হচ্ছে না, সেগুলোকে বাছাই করে আলাদা করে ফেলতে হবে। তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে যখন তুমি এক সাংঘাতিক স্বচ্ছতার সঙ্গে বুঝে যাও কোথায় ব্যর্থ হয়েছ তুমি; ঠিক এই জায়গাটায় তোমার সেই বিশেষ মনোভাবটির পরিচয় ফুটে ওঠে, যে-সময় তুমি আসলে ছবিগুলো তুলেছিলে। এটা কি অনিশ্চয়তা থেকে জন্ম নেওয়া একধরনের দ্বিধার মনোভাব? নাকি দৃশ্যটির ঘটমানতা আর তোমার অস্তিত্বের মাঝখানে একটা বড়ো ফাঁক থেকে যাওয়ার কারণ? নাকি এটা পুরো বিষয়টার কিছু বিশেষ খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ না করার কারণ? অথবা (এটাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটে) তোমার দৃষ্টি কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তোমার লক্ষ্য স্থির ছিল না।

আমাদের প্রত্যেকের কাছে আমাদের দৃষ্টি থেকেই পরিসর শুরু হয়, আবার সরে যায়, আর সেখান থেকে ক্রমশ নিজেকে অনন্তের দিকে ক্রম-প্রসারিত করে দেয়। স্থান বা পরিসর এই বর্তমানে আমাদের বড়ো মাত্রায় বা ছোটো মাত্রায় আঘাত করে এবং তারপর আমাদের ত্যাগ করে, আমাদের স্মৃতির ভেতরে বন্দি হবার জন্য; এবং সেখানে ক্রমশ নিজেকে পরিবর্তিত করে তোলার জন্য। সমস্ত প্রকাশমাধ্যমের মধ্যে ফোটোগ্রাফিই একমাত্র যা কোনো নির্দিষ্ট অপস্রিয়মাণ মুহূর্তকে ধরে রাখে। আমরা ফোটোগ্রাফাররা সেই-সব মুহূর্তের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি, যারা প্রতি মুহূর্তে মিলিয়ে যাচ্ছে; আর যখন তারা মিলিয়ে যায় তখন এ-দুনিয়ার কোনো কৃৎকৌশলই আর তাদের ফিরিয়ে আনতে পারে না। আমরা কখনো স্মৃতিকে ডেভেলপ ও প্রিন্ট করতে পারি না। এটা একজন লেখকের পক্ষে সম্ভব। গ্রহণ, বর্জন, আবার গ্রহণের মধ্যে দিয়ে যেতে পারেন, আর তাঁর চিন্তাগুলো কাগজে লিপিবদ্ধ করার আগে তিনি যাবতীয় উপাদানগুলোকে একসূত্রে বেঁধে দিতে পারেন। এমন একটা সময়ও আসে যখন তাঁর মস্তিষ্ক 'বিস্মৃত' হয়, আর অবচেতন তাঁর চিন্তাগুলোকে বিন্যস্ত করে। কিন্তু ফোটোগ্রাফারের ক্ষেত্রে যে-দৃশ্য একবার চলে গেল তা চিরতরেই চলে গেল। এই বাস্তবতা থেকেই আমাদের পেশার দুশ্চিন্তা এবং শক্তি জেগে ওঠে। হোটেলে ফিরে আমরা আবার আমাদের ছবির গল্পে ফিরে যেতে পারি না। আমাদের কাজ হলো বাস্তবকে অনুধাবন করা। প্রায় একই সঙ্গে তাকে আমাদের ক্যামেরা নামক স্কেচবইটিতে লিপিবদ্ধ করা। কোনোমতেই আমাদের সত্যকে বিকৃত করার চেষ্টা করা উচিত নয়। তেমনই যখন আমরা ছবি তুলছি, তাকে ডার্করুমে নিয়ে গিয়ে বদলে ফেলাও উচিত নয়। যাদের দেখার দৃষ্টি আছে, এই-সব কৃৎকৌশল তাদের চোখে ঠিকই ধরা পড়ে যাবে।

ছবি দিয়ে গল্প বলার ব্যাপারে বক্সিং-এর রেফারির মতো আমাদের প্রতিটা পয়েন্ট আর রাউন্ড গুনতে হয়। যে-ধরনেরই ছবিতে আমরা গল্প বলার চেষ্টা করি না কেন, আমাদের সেখানে অনধিকারী হিসাবে প্রবেশ করতে হয়। সেজন্য যতটা সম্ভব নিঃশব্দে আমাদের বিষয়ের দিকে অগ্রসর হতে হয়— বিষয়টা যদি স্টিল লাইফ হয়, তা-ও। ভেলভেটের মতো হাত, আর বাজের মতো চোখ— এই দুই হলো আমাদের অস্ত্র। গুঁতোগুতি বা কনুই

মারা কোনো কাজের কথা নয়। আর যতটা সম্ভব ফ্ল্যাশলাইটের ব্যবহার না করে ছবি তোলা— একমাত্র প্রকৃত আলোকে যথাযথ সম্মান দেখাতে পারে না এমন একটা অবস্থা ছাড়া— এমনকি যদি এমনও হয় যে, আলো প্রায় নেই বললেই চলে। যদি কোনো ফোটোগ্রাফার এই-সব নিয়মে অভ্যস্ত না হয় তাহলে সে একটা অসহনীয় রকম আগ্রাসী চরিত্রে পরিণত হবে।

ফোটোগ্রাফার যাদের ছবি তুলছে তাদের সঙ্গে তার সম্পর্কের ওপর এই পেশাটা এমনভাবে দাঁড়িয়ে যে, কোনো একটা মেকি সম্পর্ক, একটা ভুল কথা বা মনোভাব সবকিছু নষ্ট করে দিতে পারে। যখন বিষয়টা কোনোভাবে কিছুটা অস্বস্তিকর তখন ব্যক্তিত্ব সেই গভীরতায় পৌঁছাতে পারে যেখানে ক্যামেরা পৌঁছাতে পারে না। নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই, কারণ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রই আলাদা এবং দাবি করে, আমরা কোনোভাবেই যেন নিজেদের নজরে না আসি। যদিও আমরা পরস্পর খুবই কাছাকাছি থাকতে পারি। দেশ থেকে দেশে, মানুষের এবং এক সামাজিক গোষ্ঠী থেকে অন্য সামাজিক গোষ্ঠীতে প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হবে। উদাহরণ স্বরূপ প্রাচ্যের বেশিরভাগ অংশেই ধৈর্য কম এমন কোনো ফোটো-গ্রাফার— অথবা যার হাতে সময় খুব কম— শেষপর্যন্ত নিজেকে উপহাসের পাত্র করে তুলবে। যদি তুমি নিজেকে বেশি প্রকাশ করে ফেলো শুধু তোমার লাইট-মিটারটা বার করে, সেক্ষেত্রে ফোটোগ্রাফির কথা ভুলে গিয়ে সেই-সব বাচ্চাদের তোমাদের মেনে নিতে হবে যারা তোমার দিকে ছুটে এসে তোমার হাঁটু ধরে ঝুলতে থাকবে।

বিষয়বস্তু

পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে চলেছে

তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই, সেইসঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পৃথিবীর মধ্যেও বিষয়বস্তু বর্তমান। বিষয়কে আমরা না করে দিতে পারি না। তা সর্বত্র বিরাজমান। তাই পৃথিবীতে যা যা ঘটে চলেছে সবকিছুর প্রতিই আমাদের স্বচ্ছ হতে হবে এবং আমাদের অনুভূতির ব্যাপারে যথাসম্ভব সৎ হতে হবে।

বিষয়বস্তু কেবলমাত্র কিছু তথ্যের আহরণ মাত্র নয়, কারণ শুধুমাত্র তথ্য খুব কমই আগ্রহের সৃষ্টি করে। যদিও তথ্যের সাহায্যে আমরা সেই নিয়মগুলোকে বুঝতে পারি যারা তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, আর সেই-সব আবশ্যিক বস্তুগুলোকে বেছে নিতে পারি যারা তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সেই-সব আবশ্যিক বস্তুগুলোকে বেছে নিতে পারি যারা বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়।

ফোটোগ্রাফিতে সব ক্ষুদ্র বস্তুও একটি অসামান্য বিষয় হয়ে উঠতে পারে। সামান্য মানবিক খুঁটিনাটিও একটা ধুয়োর মতো কাজ করতে থাকে। আমরা আমাদের চারপাশের পৃথিবীকে দেখি ও দেখাই, কিন্তু এটা নিজে থেকেই একটা বিশেষ ঘটনা যা আঙ্গিকের ভেতরে যে-জৈবিক-ছন্দ বিরাজ করে তাকে উসকে দেয়।

যা আমাদেরকে অধিকার করে তার সত্তাটিকে পরিশুদ্ধ করে তোলার অসংখ্য পথ রয়েছে; তাদের যেন কোনো তালিকাভুক্ত না করি আমরা। বরং যেন আমরা তাদের আপন প্রাণের মহিমায় আরো সতেজ হয়ে উঠতে দেই।

একটা গোটা ক্ষেত্র রয়েছে যাকে কখনোই চিত্রশিল্পের মাধ্যমে অন্বেষণ করা সম্ভব নয়। কারো কারো মতে এটা ফোটোগ্রাফির আবিষ্কারের ফলে ঘটেছে। শেষপর্যন্ত এটা এমনভাবে ঘটেছে যে, ফোটোগ্রাফি এই ক্ষেত্রটির একটা অংশ বিবৃতির মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছে।

যে-বিশেষ-বিষয়টিকে বর্তমান কালের চিত্রশিল্পীরা কিছুটা উপহাস করেন তা হলো পোর্ট্রেট। ফ্রককোট, সৈনিকের টুপি, ঘোড়া আজ সবচেয়ে বোদ্ধা চিত্রশিল্পীদের বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে। ভিক্টোরিয়ান পোর্ট্রেট আঁকিয়েদের গোড়ালি অব্দি ঢাকা পোশাকের বোতামে যেন তাঁদের দম আটকে আসে। ফোটোগ্রাফারদের ক্ষেত্রে— যেহেতু আমরা এমন কিছুর জন্য চেষ্টা করছি যার মূল্য চিত্রশিল্পীদের কাজের চেয়ে অনেকটা ক্ষণস্থায়ী— এগুলো ততটা বিরক্তিকর নয়, কারণ আমরা জীবনকে তার সব বাস্তবতা দিয়ে গ্রহণ করি।

পোর্ট্রেট-এর মাধ্যমে মানুষের নিজেকে চিরকালীন করে যাওয়ার একটা ইচ্ছা কাজ করে, আর তাই তারা তাদের সেরা মুখচ্ছবিগুলো ভাবীকালের উদ্দেশে নিবেদন করে। যদিও এই ইচ্ছার সঙ্গে মিশে যায় একরকম কালো জাদুর ভয়; এইরকমের একটা অনুভূতি যে, ক্যামেরার সামনে পোর্ট্রেটের সামনে বসা মানে এক ধরনের ডাকিনী বিদ্যার সামনে তাদের নিজেদেরকে উন্মোচিত করে দেওয়া।

পোর্ট্রেট-এর ক্ষেত্রে যেটা অন্যতম চিত্তাকর্ষক ব্যাপার সেটা হলো কিভাবে তারা মানুষের মানুষী সত্তাকে খুঁজে পেতে মানুষকে আরো সক্ষম করে তোলে। মানুষের এই প্রবহমানতা— কোনোভাবে যা তাকে গড়ে তোলে সেই বাহ্য জগতের ভেতর থেকে জেগে ওঠে— যদিও

ব্যাপারটা পারিবারিক অ্যালবামের ছবিতে কারো কাকাকে ছোটো ভাইপো হিসাবে ভুল করার মতো ঘটনাও হতে পারে। যদি ফোটোগ্রাফারকে কারো ব্যক্তিগত পৃথিবীর প্রতিফলন হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ অর্জন করতে হয়— যেখানে তাঁর ভেতর ও বাইরের গুরুত্ব সমান— তখন এটা প্রয়োজনীয় যে, যাঁর পোর্ট্রেট তোলা হচ্ছে তিনি যেন ফোটোগ্রাফারের কাছে স্বাভাবিক হিসাবে প্রতিভাত হন। যে-পরিবেশ সেই মানুষটিকে ঘিরে আছে তাকে আমাদের অবশ্যই সম্মান জানাতে হবে, ব্যক্তি হিসাবে তিনি কোথায় অবস্থান করেন সেই জায়গাটির ছবির দিকে একাগ্র হতে হবে— কারণ প্রত্যেক মানুষের পশুদের মতো একটা নিজস্ব বসবাসের জগৎ আছে। সর্বোপরি ক্যামেরার সামনে যিনি বসছেন তাঁকে ক্যামেরা এবং সেই ফোটোগ্রাফার যিনি তাঁর ছবি তুলবেন, তার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে। জটিল যন্ত্রপাতি, আলোক-প্রতিফলক এবং আরো অন্যান্য বহু জিনিস আমার মনে হয় মানুষটিকে নিজের খোলস থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে যথেষ্ট।

মানুষের মুখের অভিব্যক্তির চেয়ে ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তমান আর কী-বা হতে পারে? কোনো-একটি মুখের প্রথম প্রকাশের ভাবটি প্রায়ই সঠিক; কিন্তু ফোটোগ্রাফার সেই প্রথম ভাবটিকে গভীরতর করে তুলতে পারেন সেই ব্যক্তির দৈনন্দিন যাপনের সঙ্গে নিজেকে অঙ্গীভূত করে নিয়ে। নির্ণায়ক মুহূর্ত আর মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ— যারা ক্যামেরার অবস্থানের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নয়— একটা ভালো পোর্ট্রেটের জন্য আবশ্যিক শর্ত। আমার মনে হয় সেই-সব মক্কেলদের জন্য পোর্ট্রেট-ফোটোগ্রাফার হওয়া বেশ কঠিন যারা শুধু অর্ডার করে আর পারিশ্রমিক দেয়; একমাত্র দু-একজন শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছাড়া, বেশিরভাগই সবসময় প্রশংসিত হতে ভালোবাসে এবং যার ফলাফল বাস্তবের সঙ্গে মেলে না। যিনি পোর্ট্রেট-এর জন্য বসছেন তিনি সবসময়ই ক্যামেরার সম্বন্ধে সন্দিহান থাকেন, এদিকে তখন ফোটোগ্রাফার তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রখর মনস্তাত্ত্বিক নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এটাই সত্য যে, একজন ফোটোগ্রাফারের সমস্ত পোর্ট্রেট-এর মধ্যে একটা সাদৃশ্যের ভাব পরিলক্ষিত হয়। ফোটোগ্রাফার, যাঁর পোর্ট্রেট হচ্ছে তাঁর একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব খুঁজে পেতে চান, এবং আপন অভিব্যক্তিটি প্রকাশের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন। একটা সত্যিকারের পোর্ট্রেট কখনো অতি মার্জিত বা কিম্ভূতদর্শন হবে না। বরং তা প্রকৃত ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটাবে।

আমি সবসময় সেই-সব তৈরি করা পোর্ট্রেট পছন্দ করি, সেই-সব ছোটো ছোটো ছবি— পাশপোর্ট ফোটোগ্রাফারের জানলায় যা পাশাপাশি বা লম্বালম্বি সাঁটা থাকে। অন্তত এই মুখগুলোর মধ্যে কিছু থাকে যারা প্রশ্ন উত্থাপন করে, সাধারণ ঘটনাকে বিবৃতি হিসাবে তুলে ধরে— যা আমরা কাব্যিক শনাক্তকরণের পরিবর্তে খুঁজে বেড়াই।

লেখক পরিচিতি সংযোজন

অঁরি কার্তিয়ে ব্রেসঁ বিশিষ্ট ফরাসি ফোটোগ্রাফার যাঁকে 'Candid photography'র জনক

বলে মনে করা হয়। 'Street photography'র ধারণা তৈরি করতেও তাঁর বিশেষ অবদান। ফোটোগ্রাফিতে *নির্ণায়ক মুহূর্ত* নামক বিশেষ ধারণাটি তাঁরই সৃষ্টি।

জন্ম ১৯০৮ সালে ফ্রান্সের শঁতলু-অঁ-বই (Chanteloup-en-Brie)-তে। বাবা ছিলেন একজন বস্ত্র-নির্মাতা, মায়ের পারিবারিক ব্যাবসা ছিল তুলোর ব্যাবসা। ছোটো বয়স থেকেই তিনি একটি ব্রাউনি বক্স ক্যামেরার সাহায্যে ফোটোগ্রাফিতে দীক্ষিত হন।

কৈশোরে কার্তিয়ে ব্রেসঁ চিত্রশিল্পের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। সমসাময়িক কিউবিস্ট চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর আন্দ্রে লোতে-র সংস্পর্শে আসেন। এই সময় চিরায়ত বিশ্বসাহিত্যের বিভিন্ন লেখক যেমন দস্তয়েভ্স্কি, মালার্মে, প্রুস্ত, জয়েস প্রভৃতি এবং নিৎশে, ফ্রয়েড, হেগেল, মার্কস প্রভৃতি দার্শনিকের রচনার সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯২৪ সালে সুররিয়েলিস্ট আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং কার্তিয়ে ব্রেসঁ শিল্পের এই বিশেষ ধারাটির প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯২৮ থেকে ১৯২৯ তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্প, সাহিত্য ও ইংরেজিতে পাঠ নেন। ১৯৩১-এ ফ্রান্সের উপনিবেশ আইভরি কোস্ট-এ চলে যান। সেখানেও তাঁর নিরন্তর ফোটোগ্রাফির চর্চা চলতে থাকে। এরপর মার্সেই-তে ফিরে আসেন ও প্রথমবার লাইকা ক্যামেরা হাতে পান। পরবর্তীতে ইউরোপের বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়ান ও অজস্র ছবি তোলেন। ক্যামেরাকে মানুষের দৃষ্টির আড়াল করার জন্য তিনি ক্যামেরাটিকে কালো টেপে মুড়ে নিয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালে তাঁর সঙ্গে রবার্ট কাপার দেখা হয়, যিনি পরে যুদ্ধের ফোটোগ্রাফিতে একজন কিংবদন্তীতে পরিণত হন। ১৯৩৫-এ আমেরিকায় যান, সেখানে তাঁব ছবির একাধিক প্রদর্শনী হয়। ১৯৩৯-এ জাঁ রেনোয়া-র সঙ্গে পরিচয়; এবং তিনি রেনোয়া-র দুটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় তিনি একটি ফ্যাসি-বিরোধী ছবি যৌথভাবে পরিচালনা করেন। ১৯৩৭-এ চিত্রসাংবাদিকতার কাজ শুরু করেন। এই বছরেই রত্না মোহিনী নামে জাভার এক নৃত্যশিল্পীকে বিবাহ করেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ কার্তিয়ে ব্রেসঁ ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির সান্ধ্য সংবাদপত্রে কাজ করতেন।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসি সেনাবাহিনীর ফিল্ম ও ফটো ইউনিটে একজন কর্পোরাল হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৪০-এ জার্মানদের হাতে বন্দি হন। দু'বার পালাবার চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর শেষপর্যন্ত সফল হন। ফ্রান্সে ফিরে এসে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যান এবং ফ্রান্সকে ফ্যাসিস্টদের হাত থেকে মুক্ত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৭-এ নিউইয়র্কের মিউজিয়ম অব মডার্ন আর্ট-এ তাঁর পূর্বাপর প্রদর্শনী আয়োজিত হয়।

সে-বছরই কার্তিয়ে ব্রেসঁ, রবার্ট কাপা, ডেভিড সুমার ও আরো কিছু ফটোগ্রাফার মিলে "ম্যাগনাম ফটোস" নামে এজেন্সি গড়ে তোলেন। এটি ক্রমশ একটি সমবায় ভিত্তিক ফটো এজেন্সি হিসাবে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে।

১৯৪৮-এ ভারতে আসেন ও গান্ধীজীর শেষকৃত্যের বহু ছবি তোলেন। এরপরেই চীন সফর ও সেখানকার বিপ্লবের বহু ছবি ক্যামেরাবন্দি করেন।

১৯৫২ সালে *নির্ণায়ক মুহূর্ত (The Decisive Moment)* নামে তাঁর বিখ্যাত বইটি প্রকাশিত হয় যার প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন আঁরি মাতিস। ১৯৫৫-তে ল্যুভ্র-এ তাঁর প্রথম চিত্র-প্রদর্শনী আয়োজিত হয়।

ছবি তোলার কাজে বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমণ করেন তিনি। ১৯৬৮ সাল নাগাদ ফোটোগ্রাফি থেকে অবসর নেন ও ক্রমে চিত্রশিল্পের দিকে পুনরায় ঝুঁকে পড়েন। জীবদ্দশায় কাম্যু পিকাসো, মাতিস, পাউন্ড, জ্যাকোমেত্তি প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের পোর্ট্রেট করেন তিনি।

তাঁর নিজের ছবি কেউ তুললে কার্তিয়ে ব্রেসঁ বিশেষ সংকোচ বোধ করতেন কারণ, নিজস্ব জগৎটিকে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে তাঁর দ্বিধা ছিল। তাই ইন্টারভিউয়ের সময় তাঁর ছবি তোলার অনুমতি দিতেন না।

২০০৪ সালের ৩রা আগস্ট তাঁর জীবনাবসান হয়।

ফোটোগ্রাফির প্রকরণ ও আঙ্গিক সম্পর্কে তাঁর একটি অসামান্য মন্তব্য হলো:

"রসায়ন ও আলোবিদ্যার নব নব উদ্ভাবন আমাদের কাজের পরিধি আরো বিস্তৃত করে দিয়েছে। এটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের উপর নির্ভর করবে যে, আমরা কিভাবে একে আমাদের কৃৎকৌশলেও কাজে লাগাব, আমাদের আরো উন্নত করব, কিন্তু কৃৎকৌশলের নামে একটা অস্বাভাবিক আসক্তির ব্যাপার তৈরি হয়েছে। কৃৎকৌশল গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ততটাই যতটা তুমি যা দেখছ তা প্রকাশ করার জন্য জরুরি... ক্যামেরা আমাদের কাছে একটা যন্ত্র, সাধারণ কোনো যান্ত্রিক খেলনা নয়। যান্ত্রিক কোনো বস্তুর নিখুঁতভাবে কাজ করে চলাটা আমাদের দৈনন্দিন প্রচেষ্টা থেকে যে-অনিশ্চয়তা ও সেই অনিশ্চয়তা থেকে উৎকণ্ঠার জন্ম হয়—সেখানে কিছুটা ভারসাম্য তৈরি করে। যাই হোক, মানুষজন আসলে যতটা বেশি প্রকৌশল নিয়ে ভাবে, দেখা নিয়ে ততটা নয়।"

উপরে আঁরি কার্তিয়ে ব্রেসঁ-র *The Minds Eye* নামক গ্রন্থটির 'The Decisive Moment' রচনাটির থেকে একটি গদ্যাংশ অনূদিত হলো।